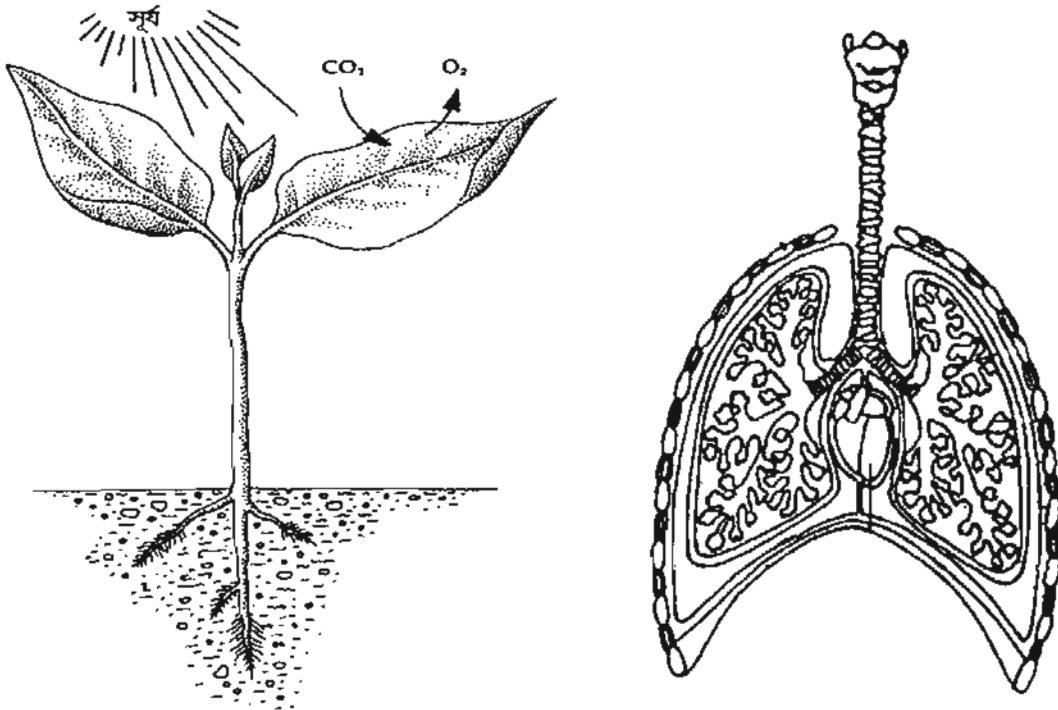


সম্ভব অধ্যায়

গ্যাসীয় বিনিময়

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সব জীবদেহে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময় জীবের একটি শারীরবৃত্তীয় কাজ। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া ভিন্নতর। উদ্ভিদ ও মানব দেহের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

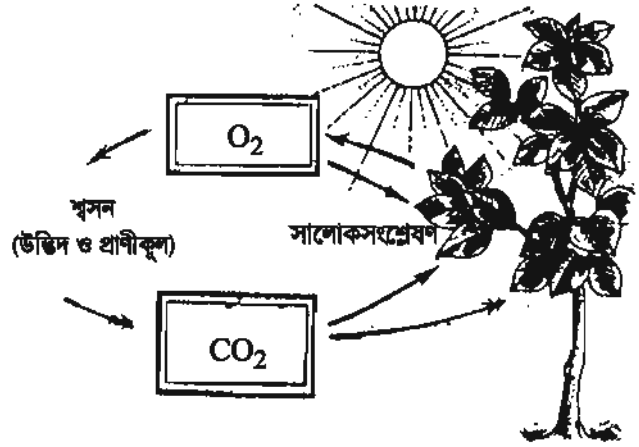


এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- উদ্ভিদে গ্যাসীয় বিনিময়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ফুসফুসের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ও গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসটির প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারব।
- ফুসফুসের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

উদ্ভিদে গ্যাস বিনিময়

আমরা জানি যে উদ্ভিদের জীবনে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) ও শ্বসন (Respiration) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। মূলত এই দুটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদে গ্যাস বিনিময় ঘটে। এই প্রক্রিয়া দুটি সংঘটিত হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। উদ্ভিদ শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য (Physiological activities) পরিবেশ থেকে বিভিন্ন গ্যাস সংগ্রহ করে। বিক্রিয়া শেষে অন্য একটি গ্যাস বাইরের পরিবেশে বের করে দেয়। উদ্ভিদে প্রাণীর মতো শ্বাস নেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ অঙ্গ নেই। তবে পত্রের স্টোমাটা ও পরিণত কাণ্ডের বাকলে লেন্টিসেল



চিত্র ৬.১ : উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়

এর মাধ্যমে অক্সিজেন (Oxygen), কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) ও অন্যান্য গ্যাসের বিনিময় ঘটে। উদ্ভিদে প্রাণীর মতো ঘন ঘন অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এর আদানপ্রদান হয় না। দিনের বেলা বা পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের হার অধিক হয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত অক্সিজেন গ্যাসের কিছু অংশ শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয়। আবার শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়, তাই আদান-প্রদানকৃত অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় সমান।

রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তাই অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। অন্যদিকে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়, ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন চলতে থাকে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাতার স্টোমাটার মাধ্যমে পরিবেশে বের হয়ে যায়। পরিণত কাণ্ডের বাকলে যে লেন্টিসেল (Lenticell) তৈরি হয় তার মাধ্যমেও এসব গ্যাসের বিনিময় ঘটে। এ জন্য বড় গাছের নিচে রাত্রিকোলা ঘুমালে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

উদ্ভিদ তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করে। পাতা যেমন বায়ু থেকে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস সংগ্রহ করে তেমনি মূল ও মাটিস্থ পানি থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করে। এভাবে উদ্ভিদ দেহে গ্যাস বিনিময় চলতে থাকে।

মানব শ্বসনতন্ত্র

অক্সিজেন জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদান। কোনো প্রাণীই অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানবদেহে বায়ুর সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে ও তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অঙ্গে পৌঁছায়। দেহকোষে পরিপাককৃত খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। ফলে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপ দেহকে উষ্ণ রাখে ও প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

অক্সিজেন ও খাদ্য উপাদানের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। রক্ত এ উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। সেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশন করা হয় তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণীদেহের খাদ্যবস্তুকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে জরিত করে মজুদ শক্তিকে ব্যবহার যোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশন করে ফর্ম-১৪, জীববিজ্ঞান ৯ম-১০ম

তাকে শ্বসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। শ্বসনের সরল বিক্রিয়াটি নিম্নবৃত্ত:



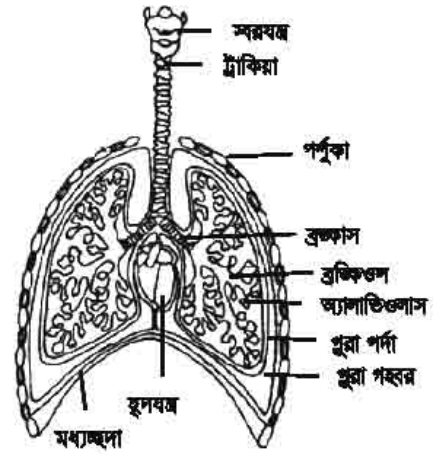
গ্লুকোজ + অক্সিজেন

কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি + শক্তি (এ.টি.পি)

সম্ভবত শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ প্রাণীতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং নিঃশ্বাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে বের করতেই হয়, তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ তিন-চার মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। দেহের সচেতন, অচেতন উভয় অবস্থাতেই অবিরাম অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন চলে। আর সাথে সাথে প্রতিনিয়ত দেহ রক্তের নানাবিধ প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। ফলে প্রাণী বেঁচে থাকে।

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) : যে অঙ্গগুলোর সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয় সেগুলোকে একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো শ্বসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। যথা—

১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ
২. গলনালি বা গলবিল
৩. স্বরযন্ত্র
৪. শ্বাসনালি
৫. বায়ুনালি বা ব্রঙ্কাস
৬. ফুসফুস
৭. মধ্যচ্ছদা



চিত্র: ৭.১ মানব শ্বসনতন্ত্র

১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ (Nasal cavity) : শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অংশের নাম নাসিকা। এটা মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহ্বর। নাক বা নাসিকার সাহায্যে কোনো বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বুঝা যায়। এক বিশেষ ধরনের স্নায়ু এ অঙ্গকে উদ্দীপিত করে, ফলে আমরা গন্ধ পাই। নাসিকা এমনভাবে গঠিত যে, তা প্রাণী বায়ুকে ফুসফুসের গ্রহণ উপযোগী করে দেয়।

নাসাপথ সম্মুখে নাসিকা ছিদ্র ও পিছাতে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা প্রাচীর দ্বারা এটি দুই ভাগে বিভক্ত। এর সম্মুখভাগ লোমাবৃত ও পিছাত্তভাগ শ্রেণী প্রস্তুতকারী পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ুতে বিদ্যমান ধূলিকণা, রোগজীবাণু ও আবর্জনা থাকলে তা এই লোম ও পর্দাতে আটকে যায়। এতে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু পরিমাণে নির্মল হয়ে যায়। এছাড়া নিঃশ্বাসের জন্য গৃহীত বায়ু নাসাপথ দিয়ে বাওরার সময় কিছুটা শুষ্ক ও আর্দ্র হয়। এর ফলে হঠাৎ ঠান্ডা বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না।



চিত্র: ৭.২ নাসাপথ ও গলবিল

২. গলবিল (Pharynx) : মুখ হাঁ করলে মুখগহ্বরের পশ্চাতে যে অংশটি দৃষ্টিগোচর হয়, সেটাই গলবিল। নাসাপথের পশ্চাতভাগ থেকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত এটা বিস্তৃত। এর পশ্চাতভাগের উপরিতলে একটি ছোট জিহ্বার মতো অংশ থাকে, এটাই আলাজিহ্বা।

খাদ্য ও পানীয় গলাধঃকরণের সময় এটা নাসাপথের পশ্চাতপথ বন্ধ করে দেয়। ফলে কোনো প্রকার খাদ্য নাসিকা পথে বাইরে আসতে পারে না।

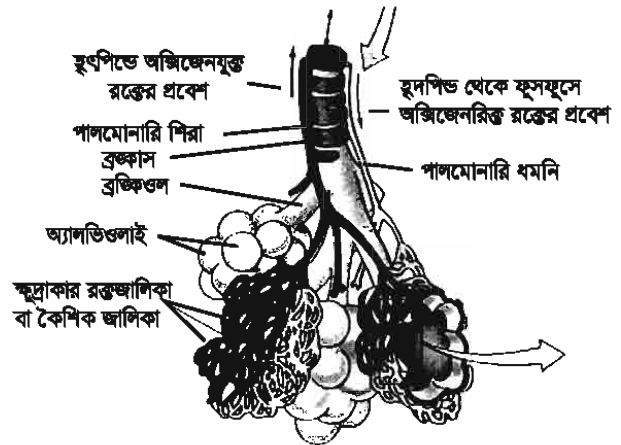
৩. স্বরযন্ত্র (Larynx) : এটা গলবিলের নিচে ও শ্বাসনালির উপরে অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের দুইধারে দুটি পেশি থাকে। এগুলো স্বররজ্জ্ব বা ভোকালকর্ড। স্বরযন্ত্রের উপরে একটি জিহ্বা আকৃতির ঢাকনা রয়েছে। একে উপজিহ্বা (Epiglottis) বলে। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময় এটি খোলা থাকে এবং এ পথে বায়ু ফুসফুসে যাতায়াত করে। আহারের সময় ঐ ঢাকনাটি স্বরযন্ত্রের মুখ ঢেকে দেয়। ফলে আহার্য দ্রব্যাদি সরাসরি খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। তবে শ্বসনে এর কোনো ভূমিকা নেই।

৪. শ্বাসনালি (Trachea) : এটি খাদ্যনালির সম্মুখে অবস্থিত একটি ফাঁপা নল। এ নালিটি স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ থেকে শুরু করে কিছুদূর নিচে গিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি বায়ুনলের সৃষ্টি করে। এগুলো শ্বাসনালি। এর প্রাচীর কতকগুলো অসম্পূর্ণ বলায়াকার তরুণাশি ও পেশি দ্বারা গঠিত। এর অন্তর্গত বিদ্রি দ্বারা আবৃত। এ বিদ্রিতে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত কোষ থাকে। এর ভেতর দিয়ে বায়ু আসা যাওয়া করে। শ্বাসনালির ভিতর দিয়ে কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রবেশ করলে সূক্ষ্ম লোমগুলো ধূলিকণাকে শ্লেষার সাথে বাইরে বের করে দেয়।

৫. ব্রঙ্কাস (Bronchus) : শ্বাসনালি স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ থেকে ফুসফুসের নিকটবর্তী হয়ে ডান ও বাম দিকে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। এ শাখাগুলো যথাক্রমে বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। এগুলো ব্রঙ্কাই নামে পরিচিত। ফুসফুসে প্রবেশ করার পর ব্রঙ্কাই দুটি অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এগুলোকে অণুক্রোম শাখা বা ব্রঙ্কিওল বলে। এদের গঠনশৈলী শ্বাসনালির অনুরূপ।

৬. ফুসফুস (Lung) : ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। বক্ষগহ্বরের ভিতর হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। এটি স্পঞ্জের মতো নরম ও কোমল, হালকা লালচে রঙের। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে এবং বাম ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত। ফুসফুস দুই ভাঁজ বিশিষ্ট পুরা নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। দুই ভাঁজের মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয়। ফলে শ্বাসক্রিয়া চলার সময় ফুসফুসের সাথে বক্ষগাত্রের কোনো ঘর্ষণ লাগে না। ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাসনালি ও রক্তনালি থাকে। বায়ুথলিগুলোই হলো অ্যালভিওলাস (Alveolus)।

বায়ুথলিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুক্রোম শাখাপ্রান্তে মৌচাকের মতো অবস্থিত। নাসাপথ দিয়ে বায়ু সরাসরি বায়ুথলিতে যাতায়াত করতে পারে। বায়ুথলি পাতলা আবরণী দ্বারা আবৃত এবং প্রতিটি বায়ুথলি কৈশিকনালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে উঠে ও পরে আপনা আপনি সংকুচিত হয়। বায়ু ও কৈশিক নালিকার গাত্র এত



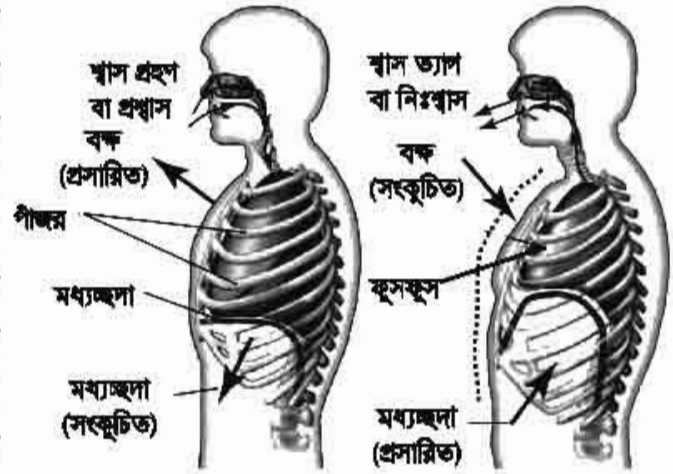
চিত্র: ৭.৩ ফুসফুস মধ্যস্থ বায়ুথলি

পাতলা যে, এর ভিতর দিয়ে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে।

কাজ-১: ফুসফুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

৭. মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) : বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বর পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটি দেখতে অনেকটা প্রসারিত হাতের মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে, তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি প্রসারিত হলে উপরের দিকে উঠে ও বক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শ্বাসক্রিয়া: শ্বাস প্রশ্বাসের অভ্যঙ্গুলো কেবলমাত্র গলবিলের দিকে খোলা থাকে, অন্য সবদিক বন্ধ থাকে। ফলে নাসাপথের ভিতর দিয়ে ফুসফুসের বায়ুখণি পর্যন্ত বায়ু নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। স্নায়বিক উদ্বেজনা দ্বারা শ্বাসকর্ষ পরিচালিত হয়। স্নায়বিক উদ্বেজনায় কারণে পিচ্ছরান্থির মাসপেশি ও মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়। কলে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে যায় ও বক্ষগহ্বরের প্রসারিত হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায়, কলে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বাইরের বায়ুর চাপের চেয়ে কমে যায়। বক্ষগহ্বরের ভিতর



চিত্র ৭.৪ : শ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ

ও বাইরের চাপের সমতা রক্ষার জন্য প্রশ্বাস বায়ু ফুসফুসের ভিতর সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই পেশি সংকোচনের পূর্ণপনই পুনরায় প্রসারিত হয়। তাই মধ্যচ্ছদা পুনরায় প্রসারিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বক্ষগহ্বরের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এতে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়, ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পসমৃদ্ধ বাতাস নিঃশ্বাসরূপে বাইরে নির্গত হয়। এভাবে মানবদেহে প্রতিনিমিত্ত শ্বাসকর্ষ চলতে থাকে। মূলত এটা বহিঃশ্বাসন।

গ্যাসীয় বিনিময় : গ্যাসীয় বিনিময় বলতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিনিময়কে বুঝায়। এটি মূলত বায়ু ও ফুসফুসের রক্তনালির ভিতরে ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময়কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা- অক্সিজেন শোষণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ।

অক্সিজেন শোষণ : শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবেশ করার পর অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর একটি বড় অংশ লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন নামক একটি অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন রক্তরস থেকে কলারস বা লসিকায় প্রবেশ করে। উল্লেখ্য যে, লসিকায় তখন অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় এ ক্রিয়াটি ঘটে। কলে রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে

যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছাড়তে থাকে। এভাবে প্রথমে অক্সিজেন রক্তরস ও পরে লসিকা বা কোষরসে প্রবেশ করে। অক্সিজেন পরিবহনের সময় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবতারণা হয় তা হলো—

ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলি ও রক্তের চাপের পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে ধমনির রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করার পর রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে পরিবাহিত হয়। বেশির ভাগ অক্সিজেনই হিমোগ্লোবিনের লৌহ অংশের সাথে হালকা বন্ধনের মাধ্যমে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। যা অক্সিহিমোগ্লোবিন নামে পরিচিত। অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন \longrightarrow অক্সিহিমোগ্লোবিন

অক্সিহিমোগ্লোবিন \longrightarrow মুক্ত অক্সিজেন + হিমোগ্লোবিন (অস্থায়ী যৌগ)

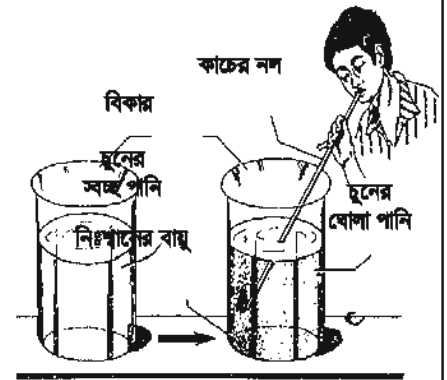
রক্ত কৈশিকনাগিতে পৌঁছার পর অক্সিজেন পৃথক হয়ে প্রথমে লোহিত রক্তকণিকার আবরণ, কৈশিকনাগির প্রাচীর ভেদ করে লসিকাতে প্রবেশ করে। অবশেষে লসিকা থেকে কোষ আবরণ ভেদ করে কোষে পৌঁছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন: খাদ্য জ্বারন বিক্রিয়া কোষে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রথমে কোষ আবরণ ভেদ করে লসিকাতে প্রবেশ করে এবং লসিকা থেকে কৈশিকনাগির প্রাচীর ভেদ করে রক্তরসে প্রবেশ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রধানত বাইকার্বনেট রূপে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে আসে, সেখানে কৈশিকনাগি ও বায়ুথলি ভেদ করে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

কাজ-১ : নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়ক পরীক্ষাঃ

উপকরণ : দুটি টেস্টটিউব, দুটি প্লাস্টিকের নল ও চুনের পানি।

পদ্ধতি : টেস্টটিউব দুটিতে সমপরিমাণ চুনের পানি নিতে হবে তারপর দুটি টেস্টটিউবের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাতে হবে যেন নল দুটি চুনের পানি স্পর্শ করে। এবার নল দুটির অপর প্রান্ত তোমার মুখে প্রবেশ করাতে হবে এবং নল দুটির ভিতর দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। ১৫ সেকেন্ড পর দ্রবণ দুটির কোনো পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ কর। যদি দুটি টেস্টটিউবের চুনের পানির কোনো পরিবর্তন না ঘটে তবে আরও ১৫ সেকেন্ড পরীক্ষণটি করতে থাক।

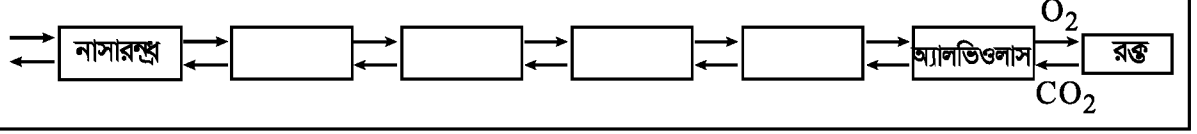


চিত্র ৭.৫: নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়ক পরীক্ষা

পর্ববেক্ষণ : একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে টেস্টটিউবের ভিতর নিঃশ্বাস বায়ু প্রবেশ করেছিল সে দ্রবণটির (চুনের পানি) রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। চুনের পানি দুধের মতো রং ধারণ করেছে। অন্য টেস্টটিউবটির চুনের পানি আগের মতোই স্বচ্ছ রয়েছে।

সিদ্ধান্ত : নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতির কারণে চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ প্রশ্বাস বায়ু থেকে বেশি থাকে। অপর পক্ষে প্রশ্বাস বায়ুতে নিঃশ্বাস বায়ু অপেক্ষা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কম থাকায় চুনের পানির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

কাঙ্ক্ষ- ২ : নিচের ছকটি পূরণ কর।



শ্বাসনাশি সংক্রান্ত রোগ

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ অঙ্গটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় অজ্ঞতা ও অসাবধানতার কারণে ফুসফুসে নানা জটিল রোগ দেখা দেয় ও সংক্রমণ ঘটে। ফুসফুসের সাধারণ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও সাবধানতাগুলো জানা থাকলে অনেক জটিল সমস্যা এমনকি মৃত্যুবুঁকিও অনেকাংশে কমানো যায়।

এ্যাজমা বা হাঁপানী (Asthma) : ভাইরাসজনিত কারণে অথবা বায়ুদূষণ বা ধূমপানের কারণে সর্দি কাশি হয়। দীর্ঘদিনের সর্দি, কাশি ও হাঁচি থেকে একসময় স্থায়ীভাবে এ্যাজমা বা হাঁপানী রোগের সৃষ্টি হয়। এটি ছোঁয়াচে বা জীবাণুবাহিত রোগ নয়।

কারণ

যে সব খাবার খেলে এলার্জি হয় (চিথড়ি, গরুর মাংস, ইলিশ মাছ ইত্যাদি), বায়ুর সাথে ধোঁয়া, ধূলাবালি, ফুলের রেণু ইত্যাদি শ্বাস গ্রহণের সময় ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানী হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্দি কাশি থেকে হাঁপানী হতে পারে।

ব্যতিক্রম: বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যায়।

লক্ষণ

- হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
- শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়, ঠোঁট নীল হয়ে যায়, গলার শিরা ফুলে যায়।
- রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, এসময় বুকের ভিতর সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়।
- ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বা বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে রোগীর বেশি কষ্ট হয়।
- কাশির সাথে কখনও কখনও সাদা কফ বের হয়।
- সাধারণত জ্বর থাকে না।
- শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাজরের মাঝে চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়।
- রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে ঔষধ সেবনে রোগী কিছুটা আরামবোধ করে।
- যেসব খাদ্য খেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় সেগুলো না খাওয়া।
- আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- যেসব জিনিসের সংস্পর্শে হাঁপানী বাড়ায় তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। যেমন- পশুর লোম, কৃত্রিম আঁশ ইত্যাদি।

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা।
- ধূমপান, গুল, সাদা পাতা, জর্দা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা।
- শ্বাসকষ্টের সময় রোগীকে তরল খাদ্য খাওয়ানো।

প্রতিরোধ

- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা।
- বায়ু দূষণ, বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এমন সব বস্তুসংস্পর্শ পরিহার করা।
- হাঁপানী রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য সবসময় সাথে ঔষধ রাখা ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা।

ব্রংকাইটিস (Bronchitis)

শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত ঝিল্লীতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণকে ব্রংকাইটিস বলে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ঝিল্লীগায়ে প্রদাহ হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্যাঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা ও ধূমপান থেকে এ রোগ হতে পারে। একবার ব্রংকাইটিস হলে বার বার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষণ এ রোগের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন- কলকারখানার ধূলাবালি ও ধোঁয়ায় পরিবেশ।

লক্ষণ

- কাশি, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- কাশির সময় রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।
- জ্বর হয়, রোগীর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।
- শক্ত খাবার খেতে পারে না।
- কাশির সাথে অনেক সময় কফ বের হয়।

প্রতিকার

- ধূমপান, মদ্যপান, তামাক বা সাদাপাতা খাওয়া বন্ধ করা।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগী চিকিৎসা করানো।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।
- পুষ্টিকর তরল ও গরম খাবার খাওয়ানো। যেমন- গরম দুধ, সুপ ইত্যাদি।
- রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া।

প্রতিরোধ

- ধূমপান, মদ্যপান ও তামাক সেবনের মতো বদাভ্যাস ত্যাগ করা।
- ধূলাবালি ও ধোয়াপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা থেকে বিরত থাকা।
- শিশু বা বয়স্কদের যেন মাথায় ঠান্ডা না লাগে সেদিকে নজর রাখা।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে এ রোগ হতে পারে। হাম ও ব্রংকাইটিস রোগের পর ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে দেখা যায়। শিশু ও বয়স্কদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ : নিউমোককাস (Pneumococcus) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ

- ফুসফুসে শ্লেষা জাতীয় তরল পদার্থ জমে কফ সৃষ্টি হয়।
- কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।
- দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বেশি জ্বর হয়।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়।

প্রতিকার

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- তরল ও গরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো।
- বেশি করে পানি পান করানো।

প্রতিরোধ

- শিশু, বয়স্কদের যেন ঠান্ডা না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- ধূমপান পরিহার করা।
- আলো বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।
- রোগীকে সহনীয় উষ্ণতায় ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।

যক্ষ্মা (Tuberculosis)

যক্ষ্মা একটি পরিচিত বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ। যেকোনো লোক, যেকোনো সময়ে এ রোগ দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, স্যাঁতসেঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, অপুষ্টিতে ভোগে অথবা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বসবাস করে তারা এ রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। আমাদের অনেকের ধারণা যক্ষ্মা শুধুমাত্র ফুসফুসের রোগ। আসলে ধারণাটা একেবারেই সঠিক নয়। যক্ষ্মা দেহের যেকোনো স্থানে হতে পারে। যেমন- অস্ত্র, হাড়, ফুসফুস ইত্যাদি। দেহে এ রোগের আক্রমণ ঘটলে সহজে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যখন জীবাণুগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধক শ্বেত রক্তকণিকাকে পরাস্ত করে দেহকে দুর্বল করে তখনই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ : Mycobacterium tuberculosis নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে অতিসহজে দেহে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটে।

রোগ নির্ণয় : চামড়ার পরীক্ষা ও এক্সরে সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

লক্ষণ

- রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনও কখনও কাশির সাথে রক্ত যায়।
- রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে। দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।
- বুকে পিঠে ব্যথা হয়।
- অজীর্ণ ও পেটের গাঁড়া দেখা দেয়।

প্রতিকার

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।
- এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগ নিবারণের নিয়মগুলো কঠিনভাবে মেনে চলা।
- রোগীকে হাসপাতালে বা স্যানিটোরিয়ামে পাঠানো অধিক নিরাপদ।
- রোগীর ব্যবহারের সবকিছু পৃথক রাখা উচিত।
- রোগীর কফ বা থুথু মাটিতে পুতে ফেলতে হয়।
- রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা।
- ডাক্তারের নির্দেশ ব্যতীত কোনো অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ করা উচিত নয়।

প্রতিরোধ

- এ মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে শিশুদের যক্ষ্মা প্রতিসেধক বি.সি.জি টিকা দেওয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- বর্তমানে দেশের বিভিন্ন টিকাদান কেন্দ্রে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

টিউমার, ক্যান্সার এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফসল। মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয়।

ক্যান্সার কোষও এই নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফসল। গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন প্রকার প্যাপিলোমা ভাইরাস ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এ ভাইরাসের ই৬ এবং ই৭ নামের দুটি জিন এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক দুটি প্রোটিন অণুকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় অর্বুদ। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুসমূহের কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কোষ, তথা ক্যান্সার।

ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ। ক্যান্সার হয় লিভারে, ফুসফুসে, মস্তিষ্কে, স্তনে, ত্বকে অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গে।

ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer)

সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে পুরুষদের ক্যান্সারে মৃত্যুর প্রধান কারণ ফুসফুস ক্যান্সার।

ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান।

- বায়ু ও পরিবেশ দূষণ এবং বাসস্থান অথবা কর্মক্ষেত্রে দূষণ ঘটতে পারে এমন সব বস্তু (যেমন— এয়াসবেস্টাস, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, কঠিন ধাতুর গুঁড়া ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসার কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- যক্ষ্মা বা কোনো ধরনের নিউমোনিয়া ফুসফুসে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়।
- ধারণা করা হয়, খাদ্য তালিকায় অঁশ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি এই রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

লক্ষণ

ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো যত দ্রুততা সাথে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা প্রদান করা যায়, বেশিদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হলো—

- দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাঁশি ও বুকে ব্যথা।
- ভগ্নস্বর, ওজন হ্রাস এবং ক্ষুদামন্দা।
- হাঁপানী, ঘনঘন জ্বর হওয়া।
- বারবার ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া দ্বারা সংক্রমিত হওয়া।
- হাড়ে ব্যথা অনুভব, দুর্বলতা, কোনো গ্রন্থি অবশ্যই হয়ে যাওয়া, জন্ডিস দেখা দেওয়া।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য থুথু বা শ্লেষা বিশ্লেষণ করা, বুকের এক্স-রে করা।

প্রতিকার

- রোগের লক্ষণগুলো দেখা গেলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- রোগ নির্ণয়ের পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সূচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে রেডিয়েশন থেরাপি প্রয়োগ করা।

প্রতিরোধ

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যথা—

- ধূমপান ও মদ্যপান না করা।
- অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- পরিমাণমতো শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

অ্যামেরিকার ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ট্রেল এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

অনুশীলনী

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোষীয় শ্বসন কাকে বলে?
২. প্লুরার কাজ কী?
৩. ব্রংকাইটিস কী?
৪. মধ্যচ্ছদার কাজ কী?
৫. নিউমোনিয়া কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটির সংক্রমণে যক্ষ্মা হয়?
 ক. ভাইরাস
 খ. ব্যাকটেরিয়া
 গ. ছত্রাক
 ঘ. প্রোটোজোয়া
২. উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ে সাহায্য করে—
 i. স্টোমাটা
 ii. লেন্টিসেল
 iii. মূলরোম

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শারীরিক দুর্বলতার জন্য রিতা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো। ডাক্তার তার দেহে রক্তের একটি বিশেষ কণিকার অপরিপাকতার কথা জানান। ঘাটতি পূরণে ডাক্তার তাকে পুষ্টিকর খাবার ও শাকসবজি অধিক পরিমাণে খেতে পরামর্শ দিলেন।

৩. রিতার রক্তে কোনটির অভাব রয়েছে?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ক. লেহিত রক্তকণিকা | খ. শ্বেত রক্তকণিকা |
| গ. অনুচক্রিকা | ঘ. রক্তরস |

৪. বিশেষ কণিকাটি—

- i. লৌহ উপাদান যুক্ত
- ii. অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে
- iii. কার্বন ডাইঅক্সাইড ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

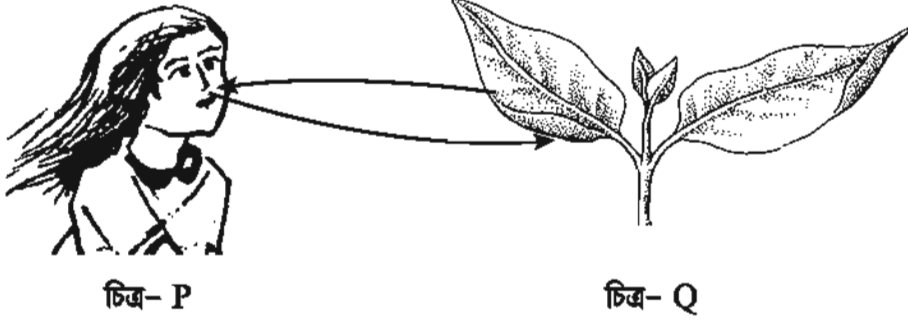
খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. রক্তের কোন কণিকা অক্সিজেন বহন করে?

খ. ট্রাকিয়া বলতে কী বুঝায়?

গ. P এর সঞ্চয়িত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্যাস বিনিময়ের ক্ষেত্রে P ও Q একে অপরের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. রাশেদ ও জামিল জাহাজ ভাঙা শিল্পে কাজ করে। কাঁশি ও বৃকে ব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভোগায় উভয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে রাশেদের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জামিলের রোগটি শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অন্ত্র ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

ক. মধ্যচ্ছদা কী?

খ. বহিঃশ্বসন বলতে কী বুঝায়?

গ. রাশেদের দেহে রোগটি কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদ ও জামিলের রোগ দুটির মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর— কারণ বিশ্লেষণ কর।